অসমাপ্ত

(গল্পগ্রন্থ – বিধু মাস্টার)

কোন্নগরে সাহিত্য-সভা করিতে গিয়াছিলাম।

আমিই সভাপতি। টানা মোটরে কলিকাতা হইতে আমায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে। সভাস্থলে পৌঁছিয়া বেজায় খাতির, কলিকাতা হইতে সমাগত আরো কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধুর সহিত পুষ্পমালাশোভিত আমারও ফটো নেওয়া হইল স্থানীয় উৎসাহী সাহিত্যবাতিকগ্রস্ত তরুণদের দ্বারা।

—এইবার আসুন, একটু জলযোগ—

—সভা কখন, সময় হল তো—

—সভার আগে সামান্য একটু চা—

বন্ধুদের দিকে ফিরিয়া বলিলাম—চল হে তবে। ওঁরা যখন নিতান্তই ছাড়বেন না—

—আসুন এদিকে—ইনিই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রামকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর, এখানকার জমিদার—

—ও ! নমস্কার ! হেঁ—হেঁ—

একগাল হাসিয়া রায়বাহাদুর প্রতিনমস্কার করিলেন।

—গরিবের বাড়িতে—সামান্য একটু-হেঁ হেঁ—। আপনার নাম অনেকদিন থেকে শোনা ছিল। আজ বড় সৌভাগ্য আপনার সঙ্গে দেখা হল। আপনার শাপমোচন পড়ে আমাদের বাড়ির এরা কেঁদে বাঁচে না। আমি এখনো পড়িনি। সময় পাই নে, মিউনিসিপ্যালিটির কাজ বড় বেশি—যদিও রিটায়ার করেছি, তবুও কাজের অন্ত নেই।—ওঁরই নাম বিনয়বাবু ?আসুন আসুন, আপনার বইও—মানে, পড়িনি—তবে নাম কে না শুনেছে আপনাদের বাংলা দেশে, বলুন !

আমরা সবাই খ্যাতির গর্বে স্ফীত হইয়া উঠি।

প্রকাণ্ড ঘর। মাঝখান জুড়িয়া লম্বালম্বি একখানা বড় টেবিল সাদা কাপড় দিয়া ঢাকা-চার-পাঁচটা ফুলদানিতে ফুল সাজানো ! বড় বড় চীনামাটির প্লেটে শিঙাড়া, কচুরি, নিমকি ও রসগোল্লা। কাচের গ্লাস সারি সারি ও কাচের জগে জল। চায়ের সরঞ্জাম।

—আসুন, বসুন—এই যে, আপনি এইদিকে—বিনয়বাবু এখানে। ওরে ফল কই ?এখনো কাটা হয়নি ?কখন আর কাটবি ?নিয়ে আয়।...ওহে সুশীল, তোমরাও বসে পড়ো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন সব ?কেনারাম কোথায় গেল ?ডেকে নিয়ে এসো। বাঃ, চা খেয়ে নাও সকলে একসঙ্গে— না না, দেওয়ার লোকের অভাব হবে না।

—ওই ছবিখানা কার ?বেশ সুন্দর চেহারা—

—আজ্ঞে, আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের। ফ্রেঞ্চ গভর্নমেন্টের দেওয়ান ছিলেন—একেবারে ডান হাত বা বাঁ হাত। আর ওই বাঁ পাশে আমার পিতামহ। আমাদের আদি বাড়ি শশধরপুর, নিম্‌তের কাছে। আমার ঠাকুরদাদার বাবার নামে গ্রামের নাম—নিমকির দারোগা ছিলেন সেখানে। ওই অঞ্চলে জমিদারি কেনেন—ওরে সিঙাড়া আরো নিয়ে আয়—খান খান—গরম শিঙাড়া—সব বাড়িতে তৈরি—দোকানের জিনিস মশাই এ বাড়িতে ঢোকে না। আমার বড়বউমার হাতে ভাজা সব। বড় ছেলে ?সে এখানে নেই—কাস্টম্‌স্-এ কাজ করে—এবার আড়াই-শ' হল—বিয়ে দিয়েছি আজ পাঁচ বছর—তারশ্বশুরও জমিদার—রায়সাহেব হরিনাথ বাঁড়ুজ্যে, হালিসহরের—নাম শুনেছেন বোধ হয় ! চা দিয়ে যা এবার—

একটি বারো-তেরো বছরের সুশ্রী বালিকা পান লইয়া আসিয়া সলজ্জ সঙ্কোচে দরজার নিকট দাঁড়াইল।

—কি ওতে রে খুকি ?পান ?রাখ এখানে রাখ—এইটি আমার ছোট মেয়ে মিনতি। লজ্জা কি এঁদের কাছে ! বেশ গান গায়, আজ সভাতে গাইবে এখন। আবৃত্তিতে আর বছর মেডেল পেয়েছিল—জলধর সেন শুনে কেঁদে ফেললেন একেবারে—

কর্তব্য ও শোভনতার খাতিরে খুকিটিকে কাছে ডাকিয়া দু-একটি মামুলি ছেঁদো কথা জিজ্ঞাসা করি, তাহার আবৃত্তি পুনরায় আমাদের কাছে করিবার জন্য জিদ ধরি, এবং পরক্ষণেই জিজ্ঞাসা করি—তাহলে ওঠা যাক সব—কি বলেন ?সভার টাইম তো হল—

—ওরে কানাই, গাড়িখানা আনতে বল্ চট করে, গেটের কাছে নিয়ে আসুক—

—না না, গাড়ি কি হবে ?দরকার নেই রায়বাহাদুর, হেঁটেই এটুকু—

—বিলক্ষণ ! ক্লাব ঘর এখান থেকে দশ মিনিটের রাস্তা। হেঁটে যাবেন কেন ?গাড়ি যখন রয়েছে—নিয়ে আয় রে—বলে দিলি না গাড়ির কথা !

সদলবলে গাড়িতে উঠিতে যাইতেছি, এমন সময় একটি আট-ন বছরের বালক পিছন হইতে আমায় ডাকিয়া বলিল—মা আপনাকে ডাকছে—

প্রায় চমকিয়া উঠিয়াছিলাম আর কি ! বিস্ময় ও অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ছেলেটির দিকে চাহিয়া বলিলাম—কাকে ?কে ডাকছেন বললে খোকা ?

বালকটি দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—আপনাকে মা ডাকছেন।

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সকলেই বিস্মিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কারণ আমি এ স্থানে পূর্বে কখনো আসি নাই, বালকটি আমায় কখনো দেখে নাই ইহা নিশ্চিত। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমাদের বাড়ি কোথায় খোকা ?

আর একজন বলিলেন—আরে ও তো আমাদের হরিজীবনের ছেলে ! তুমি হরিজীবনের ছেলে না ?হ্যাঁ, ওই দোতলা বাড়ি। এঁকে ডাকছেন তোমার মা ?এই বাবুকে ?

বালক চারিদিক হইতে জেরায় একটু দমিয়া গিয়া সঙ্কোচের সুরে বলিল—এই বাবুকেই তো মা বললেন ডাকতে ! মা বললেন—যিনি চাদর গায়ে গাড়িতে উঠছেন—

—যান মশায়, দেখে আসুন। ওর বাবার নাম হরিজীবন মুখুজ্যে, রেলে কাজ করে, আমাদের এখানে বাসা। চিনতে পেরেছেন ?হরিজীবন এখন বাড়ি নেই, বোধ হয় ডিউটিতে গিয়েছে। তোমার বাবা বাড়ি আছেন খোকা ?

বুঝিতে পারিলাম না কে হরিজীবন ! কিন্তু এই বালকটির মুখের আদল আমার অত্যন্ত পরিচিত মনে হইল, যেন পূর্বে এ ধরনের মুখ কোথায় দেখিয়াছি !

বাড়ির দরজায় পা দিতেই দরজার আড়াল হইতে যে হাসিমুখে বাহির হইয়া আসিল, তাহাকে দেখিয়াই চমকাইয়া উঠিলাম। ইহাকে তো চিনি ! অনেক দিন আগে ইহার সহিত খুব জানাশোনা ছিল। কিন্তু নাম কিছুতেই মনে আনিতে পারিলাম না। মেয়েটি আমার পায়ের ধুলা লইয়া প্রণামকরিয়া বলিল—কি যতীনদা, চিনতে পারেন ?কে বলুন তো ?

—এসো এসো—থাক্। কল্যাণ হোক। ভালো আছ বেশ ?...সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রাণপণে মেয়েটির নাম মনে আনিবার চেষ্টা করিলাম। আমার মনে পড়িল ইহার সঙ্গে আলাপ হইবার একমাত্র সম্ভবপর স্থান হইতেছে কৃষ্ণনগর, যেখানে থাকিয়া কলেজে পড়িয়াছিলাম—অন্য কোথাও মেয়েদের সঙ্গে আমার আলাপ হয় নাই। কিন্তু ষোল-সতেরো বৎসর পূর্বের সেই দিনগুলিতে, ভাবিয়া দেখিলাম অনেকগুলি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল শুধু এই কারণে যে, আমি যে বাড়িতে থাকিতাম সে বাড়িতে সঙ্গীতচর্চা উপলক্ষে পাড়ার অনেক মেয়ে জড়ো হতই। তাছাড়া কবিতা আবৃত্তির প্রতিযোগিতা, ছোট ছোট মেয়েদের থিয়েটার প্রভৃতি সম্পর্কে মেয়েদের সাহায্য করিতে অনেকবার অনুরুদ্ধ হইতাম—

সে উপলক্ষেও অনেক মেয়ের সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম। সেখানেই যদি ইহার সহিত দেখাশুনা হইয়া থাকে তবে নাম মনে আনিবার চেষ্টা বৃথা। কারণ their name is Legion.

বসুন যতীনদা।

—ইয়ে—গিয়ে, বসব বটে, কিন্তু ঘুরে আসি, সভা রয়েছে কিনা ?সভার টাইম প্রায় হয়ে গেল।

মেয়েটি হাসিয়া বলিল—হুঁ, আপনি আবার সাহিত্যিক হয়েছেন, সভায় সভাপতিত্ব করবেন। এসব ভাবলে আমার হাসি পায়। উঃ, কি বখাটেই ছিলেন।

চুপ করিয়া রহিলাম—যদিও ঠিক বুঝিলাম না আমার মধ্যে বখাটেগিরির কি দেখিয়াছিল এ ! এবং আমার তো মনে হয় না আমি সত্যিকারের বখাটে যাহাকে বলে তাহা ছিলাম কোনোদিন। কিন্তু তাহা লইয়া তর্ক তুলিবার ইহা সময় নয়।

মেয়েটি আবার বলিল—কতদিন ভেবেছি, আপনি কোথায় চলে গেলেন, আপনার সঙ্গে হয়তো আর দেখা হবে না। কিন্তু ভগবান দেখা করিয়ে দেন এমনি করে।

আমি এবার ইহাকে অনেকখানি মনে আনিতে পারিয়াছি।

জিজ্ঞাসা করিয়াই ফেলিলাম—তোমার নাম শান্তি না ?

ছেলেটি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—কেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে নাকি ?

বলিতে পারিলাম না যে, সন্দেহ তো দূরের কথা, নামটাই মনে ছিল না এতক্ষণ। কিন্তু এবার ইহাকে বুঝিয়া ফেলিয়াছি। আজ পনেরো-ষোল বছর আগে ইহার সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল—তার পর আর কখনো দেখি নাই বটে, কিন্তু এখন মনে হইতেছে অতগুলি মেয়ের মধ্যে এই মেয়েটির ব্যবহার ছিল সর্বাপেক্ষা আন্তরিক ও সরল, তখনকার মনোভাবে আমি ইহাকে সেইজন্যে আমল দিই নাই—গায়েপড়া বলিয়া মনে করিতাম।

শান্তি বলিল—আপনি আজকাল থাকেন কোথায় ?

—কলকাতাতেই আছি আজ আট-ন' বছর। খবরের কাগজের আপিসে চাকরি করি।

—বিয়ে করেছেন ?

—বহুদিন।

—ছেলেপিলে হয়েছে ?

—চার মেয়ে। আর কিছু শুনতে চাও ?

—বাজে কথা, আপনি কক্ষনো বিয়ে করেননি !

—এ কথা ভাববার হেতু কি ?

—আপনাকে আমি খুব ভালোই জানি। আমার চোখে ধুলো দিতে পারবেন না। বলুন সত্যি কিনা ?

হাসিয়া ফেলিলাম, সঙ্গে সঙ্গে বড় ভালোও লাগিল। পনেরো বছর পূর্বে এক-আধ বছরের জন্য যে মেয়ের সঙ্গে অত্যন্ত ভাসা-ভাসা ধরনের আলাপ হইয়াছিল, তাহাকে আমার চরিত্র ও মনোবৃত্তি সম্বন্ধে এমন নিঃসন্দিগ্ধ মত প্রকাশ করিতে দেখিয়া ভালো লাগিবার কথা বটে। এ এমন এক ধরনের আত্মীয়তা যাহা অন্য কোনো উপায়ে প্রকাশ করা যায় না, বা অন্য কোনো ধরনের ব্যবহার দ্বারা ইহার স্থানও পূর্ণ হয় না !

বলিলাম—ধরে যখন ফেলেছ শান্তি, তখন মিথ্যে বলে লাভ নেই। বিয়ে এখনো করিনি।

শান্তি সগর্বে বলিল—দেখুন, বললাম যে আপনাকে তখনই আমি চিনে ফেলেছিলাম, ঠিক কিনা ভালো করে বলুন এবার।

বলিলাম—তাহলে এখন আসি শান্তি—সভার পরে না হয় আসব এখন একবার। তোমার স্বামী কখন আসবেন ?আলাপ হলে বেশ আনন্দ হত। সন্ধের পর ?বেশ, আমারও আসতে রাত আটটা বাজবে, বুঝেছ !

—এখানে আজ রাত্রে খাবেন কিন্তু বলা রইল।

সভার পরে পুনরায় শান্তির ওখানে ফিরিতে প্রায় রাত্রি নটা বাজিল। শান্তির স্বামীর সঙ্গে আলাপ হইল—বেশ ভালো লোক। আমার আসিবার খবর শুনিয়া ভদ্রলোক বাছিয়া বাছিয়া বাজার করিয়াছেন, সব রান্না শেষ করিতে শান্তির বেশ সময় লাগিবে—রাত দশটার কমে রান্না সাঙ্গ হইবে বলিয়া মনে হইল না। শান্তি চা করিয়া দিয়া গেল। আমি বসিয়া তাহার স্বামীর সঙ্গে গল্প করিতে লাগিলাম।

একবার শান্তি রান্নাঘর হইতে আসিয়া বলিল—বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে ?

—ও জিনিসটির প্রাদুর্ভাব তোমাদের আতিথেয়তার কল্যাণে আদৌ হবার উপায় নেই। এসে পর্যন্ত খাওয়া চলছে। তুমি নিরুদ্বেগে বসে রাঁধতে পারো যতক্ষণ খুশি।

আহারাদির পরে শান্তি বসিয়া গল্প করিতে লাগিল। শান্তির স্বামী দু-একবার হাই তুলিয়া বলিলেন—আমার কাল খুব সকালে ডিউটি—যদি কিছু মনে না করেন, আমি গিয়ে শুয়ে পড়ি।

—বিলক্ষণ ! শোবেন বই কি। আমিও তাহলে—

—শান্তি, তুমি বরং বসে গল্প করো। আমি যাই। এঁর বিছানা করে রেখেছ তো ?মশারিটা খাটিয়ে দিয়ো।...স্বামী উঠিয়া চলিয়া গেলে শান্তি বলিল—ঘুম পেলে শুনছি নে কিন্তু। আজ সারারাত বসে গল্প করতে হবে। কতকাল পরে দেখা !

—সারারাত ! বলো কি !

হঠাৎ শান্তি বলিল—কেন না ?আপনি আমায় কত কষ্ট দিয়েছিলেন জানেন ?

আমি অবাক হইয়া ওর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম—কিসের কষ্ট ?

—কিসের কষ্ট জানেন না তো ?জানবেনই বা কি করে, আচ্ছা দাঁড়ান দেখাচ্ছি। বলিয়াই সে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে একটি ছোট কাঠের বাক্স আনিয়া আমার সামনে খুলিল। একটা পত্র আমার সামনে ধরিয়া বলিল—দেখুন পড়ে !

পড়িয়া দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম। আমার মাসিমা পরলোকে গমন করিয়াছেন আজ দশ বছর কি তার বেশি। তাঁর হাতের লেখা খুব ভালো করিয়াই চিনি। মাসিমা শান্তির মাকে চিঠিতে আমার সহিত শান্তির বিবাহের প্রস্তাব করিতেছেন এই চিঠিতে।

বলিলাম—তুমি এ পত্র পেলে কোথায় ?

—যেদিন এ পত্র এসেছিল, সেই দিনটি থেকে পত্রখানা আমার কাছে। আপনিও তার পর আর কখনো আজিমগঞ্জে যাননি। সেই শ্রাবণ মাসে যে চলে এলেন—এই আবার এতকাল পরে দেখা !

—কিন্তু আমি এ ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও জানতাম না, একথা বললে তুমি কি বিশ্বাস করবে শান্তি ?

শান্তি অবাক হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—জানতেন না মানে ?সব জানতেন !

—কেন বলো তো তুমি একথা বলছ ?

শান্তি হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—সব জানি যতীনদা, সব জানি। আমার চোখে আবার ধুলো দেবার চেষ্টা ?একবার তো করে দেখলেন, ঠকে গেলেন নিজেই !

—কি চেষ্টা করলুম তোমার চোখে ধুলো দেবার ?

—ওই যে বললেন বিয়ে করেছেন, চার মেয়ে হয়েছে ! আমি আর জানি নে আপনাকে ?বিয়ে আবার আপনি করবেন ! কেন বিয়ে করেননি, তার কি আমার অজানা ভাবছেন ?এক এক সময় তাই মনে হয়েছে, এই ষোল বছরের মধ্যে—যদি কখনো দেখা হয়, পায়ে ধরে আপনার কাছে মাপ চেয়ে নেব। আমি তো গিয়েছিই—আপনি কেন যাবেন সেই সঙ্গে ?—সেই কথাটা বলবার সুযোগ পেলুম এতকাল পরে।

বিস্ময়ে আমার মুখে কথা যোগাইল না। শান্তি বলে কি ! এমন ভুলও মানুষের হয় ?সমস্ত কথাটা বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখিবার সময় নয় এটা—তবুও এক চমকে ইহার মনের অনেকখানিই দেখিতে পাইলাম। সভা করিতে আসিয়াছি বিদেশে, আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া এতখানি দরদ দেখাইবার ঠিকমতো কারণ আমি অনেক হাতড়াইয়া খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না—অনেকখানি পরিষ্কার হইয়া গেল এবার।

কিন্তু মেয়েটি কি ভুলই নিজের বুকের মধ্যে এই ষোল বছর পুষিয়া রাখিয়াছে। আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইল কতকগুলি কথা জানিবার। বলিলাম—আজ যখন এখানে এলাম, তুমি কি করে আমায় চিনলে এতকাল পরে ?

—সভার জন্যে কাগজ ছাপিয়ে বিলি করেছিল—আপনার নাম দেখলাম। তা ছাড়া স্মরজিৎবাবুর ছেলে আপনার পরিচয় সেদিন দিচ্ছিল ওঁর কাছে আমাদের বাড়ি বসে। আমি তখনই ওঁকে বললাম, যতীনদা আমার বাপের বাড়ির দেশের লোক। উনি বললেন, রায়বাহাদুরের বাড়ি আপনাদের চা খাওয়ার আয়োজন হয়েছে—তাই শুনে জানলায় দাঁড়িয়ে ছিলাম।

—দেখেই চিনলে এতকাল পরে ?

—ওমা, কেন চিনব না। আপনারা আমাদের ভাবেন কি ?

এখন ইহাকে ভালো করিয়াই মনে পড়িয়াছে—আমার কিছুদিনের বাল্যসঙ্গিনী একটি অত্যন্ত মুখরা, চঞ্চলা বালিকার ছবি। আবছায়াভাবে ইহার দু-একটি বাল্যলীলাও মনে পড়িতেছে।

বলিলাম—শান্তি, নিতাইয়ের মা সেই বুড়ো গিন্নির শিব চুরির কথা মনে পড়ে ?

শান্তি হাসিয়া বলিল—খু-উ-ব ! চুরি করলেন আপনি আর ধনা—ধনাকে মনে আছে ?—সে আজকাল পাটের কলে কাজ করে নৈহাটিতে, মধ্যে একদিন এখানে এসেছিল আজ বছর তিন চার আগে—আর গাল খেয়ে মলুম আমি আর ছোড়দি।

—কেন, তোমরা তো সাহায্য করেছিলে, করোনি ?পুজোর ঘরের শেকল তুলে দিতে বলেছিল বুড়ো গিন্নি—শেকল তুলে না দিয়ে বলেছিলে, দিয়েছ। আর একদিন তুমি জাঁতি দিয়ে আঙুল কেটে ফেলেছিলে, মনে আছে ?কেঁদেছিলে খুব ?

শান্তি ছেলেমানুষের মতো মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিল—হ্যাঁ, কেঁদেছিলে খুব ! ছাই মনে আছে—কাঁদবার মেয়েই আমি ছিলাম কিনা !

—তবু যদি আমার মনে না থাকত !

—কি মনে আছে শুনি ?

মনে আছে তুমি কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিলে।

শান্তি অবাক হইয়া গালে হাত দিয়া বলিল—ওমা, কি মিথ্যেবাদী।

আমার হাসি পাইল। বলিলাম—ছেলেবেলার মতো ঝগড়া পাকিয়ে তুলছ শান্তি ! অভ্যেস কি কখনো যায় !

শান্তি হাসিতে হাসিতে বলিল—আচ্ছা যতীনদা—শিবতলার বটগাছে ভারা বেঁধে দিতে তো ফি বছর পরীক্ষার আগে—খুলেছিলেন কোনোদিন ?

সত্যিই অনেক কথা দেখিতেছি মনে রাখিয়াছে শান্তি। আমার নিজেরই মনে ছিল না। মেয়েরা বড় মনে রাখে।

রাত অনেক। শান্তি বলিল—আর না যতীনদা, রাত হয়েছে, শুতে যান। যদিও আমার ইচ্ছে করছে আজ সারারাতটা আপনার সঙ্গে বসে গল্প করি। কাল সকালে উঠেই যেন চলে যাবেন না, খাওয়া-দাওয়া সেরে তবে—

—কাল তা কি করে হবে শান্তি ! কাল সোমবার, সব খোলা—খেয়ে যেতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। আমি সকালে চা খেয়েই চলে যাব।

শান্তি কর্তৃত্বের সুরে বলিল—সে হবে এখন। সেজন্যে আপনার ভাবতে হবে না—কাল সকালে উঠে দুটো আপিসের ভাত দিতে আমার আর হাত-পা খোঁড়া হয়ে যাবে না !

রাত্রে বিছানায় শুইয়া শুইয়া ভাবিলাম ব্যাপারখানা। শান্তিকে প্রতারণা করিলাম বটে, স্বীকার করি সেটা বড়ই খারাপ কাজ, কিন্তু সত্য কথা খুলিয়া বলিলেই কি সে খুশি হইত ?ওর জীবনে হয়তো এইটুকু ভাবিয়াই উহার সুখ—কেন সে সুখটুকু নষ্ট করিব ?

পরদিন সকালে না খাওয়াইয়া শান্তি কি ছাড়ে ! খুব ভোরে উঠিয়া এটা সেটা রাঁধিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। সাড়ে আটটায় আমার গাড়ি। তার অনেক আগে সে আমায় চার-পাঁচ রকমের তরকারি করিয়া খাওয়াইয়া দিল।

পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—আবার কবে আসবেন দাদা ?

—সময় তো পাই নে। তবে—ইয়ে—আসব বইকি।

হঠাৎ খপ করিয়া আমার হাত দুখানা তাহার দুই হাতের মধ্যে লইয়া আর্দ্র কণ্ঠে অথচ দৃঢ়স্বরে বলিল—না দাদা, আমি সব জানি, সব বুঝি। আপনি যে নিজের জীবনটা এভাবে কাটিয়ে দিলেন, সেজন্যে আমার মনে তুষের আগুন জ্বলে দিন-রাত। আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে, রাখবেন বলুন ?

—কি অনুরোধ বলো শান্তি !

—আপনি বিয়ে করুন—করতেই হবে আপনাকে বিয়ে। আমার অপরাধের বোঝা আর বাড়াবেন না। বলুন অনুরোধ রাখবেন ?

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। এ কথার কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না।

শান্তি আবার বলিল—চুপ করে থাকলে হবে না। আমার কাছে বলে যান।

—আচ্ছা, ভেবে দেখি শান্তি।

—বেশ, তো ভাবুন, এইটুকু যে বলেছেন এবার সেই যথেষ্ট। আবার এই মাঘ মাসে সরস্বতী পুজোর সময় আসবেন বলুন ?

—আচ্ছা, তা বরং—

—না, ওসব শুনব না। বরং-টরং না, আসতেই হবে বলে দিলাম। আমি পথের দিকে চেয়ে থাকব—

—আসব।

পথে উঠিয়া দেখি, শান্তি রান্নাঘরের জানালায় দাঁড়াইয়া পথের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে।

বাড়ি ফিরিয়া স্ত্রীর কাছে ঘটনাটা বলিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত না বলাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলাম।